দৈনিক সংবাদ

760

তারিখ ... MAR. 11 2000
পৃষ্ঠা 2 কলাম

এই পাবলিক পরীক্ষার অবসান হোক

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

গত ২ মার্চ তারিখে শুরু হয়েছে দু'টি পাবলিক পরীক্ষা। একটি এসএসসি, অপরটি দাখিল। এসএসসিতে অংশ নিয়েছে ৯ লাখের অধিক, দাখিল পরীক্ষায় প্রায় দেড় লাখ। পাবলিক এই পরীক্ষা দু'টি, অনুষ্ঠিত করার জন্য দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা বন্ধ রয়েছে, হয় এগুলো পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, নতুবা স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহের সম্মানিত শিক্ষকগণ পরীক্ষার দায়িত্ব পালন করছেন। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে কেন্দ্রসমূহে দায়িত্ব পালন করছেন পুলিশবাহিনীর সদস্যবৃন্দ, কয়েক হাজার ম্যাজিস্ট্রেটসহ স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ। দেশের ১০ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনের ভবিষ্যৎ তৈরির জন্য এ দেশের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ রাখা, থানা-প্রশাসন-পুলিশবাহিনীকে পরীক্ষা কাজে যুক্ত রাখা ইত্যাদি সার্থক হতো যদি সেই পাবলিক পরীক্ষা যথার্থ অর্থেই পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হতো, দেশ ও জাতি বোধ হয় সান্ত্বনা খুঁজে পেতো, ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু এখন বোধ হয় নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায় যে, এতো ত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে দেশে এ ধরনের কোনো পাবলিক পরীক্ষার আর প্রয়োজন নেই। এটি হঠাৎ করে হয়তো বন্ধ করে দেওয়া যাবে না, তবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া বর্তমান পাবলিক পরীক্ষার অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে। এর আর কোনো প্রয়োজন নেই। পাবলিক পরীক্ষার নামে যা কিছু চলছে তা বন্ধ করা ব্যতীত এই জাতির এখন বোধ হয় দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই।

পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রতিবছরই পাবলিক পরীক্ষায় গণনকল, ভাঙচুর, ছাত্র বহিষ্কার, শিক্ষক বহিষ্কার, শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়া, ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্ছিত হওয়া, গণটোকাটুকি ইত্যাদি বিচিত্র ছবি ও প্রতিবেদন ছাপা হয়ে থাকে। এই দৃশ্য প্রতিবছরই কমবেশি দেখা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড থেকে পরীক্ষার আগে আগে নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার আদেশের কথা বলা হয়ে থাকে, কেন্দ্রসমূহে ১৪৪ ধারা জারি করার কথা প্রচারমাধ্যম থেকে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু পরীক্ষার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নকলমুক্ত পরীক্ষার কথা কতিপয় পরীক্ষা কেন্দ্র ব্যতীত কোথাও খুব একটা দেখা যায় না, শোনা যায় না। এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুষ্ঠিত বিএ (পাস), অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষাগুলোও নকলমুক্তভাবে হওয়ার দাবি করা যাচ্ছে না। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলো এদিক থেকে অনেকটা মুক্ত, যদিও পরীক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি থেকে ঐগুলো খুব একটা মুক্ত নয় বলে আমি মনে করি। কেন পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে এমন নজিরবিহীন লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, অথচ এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের অপরাধবোধ, লজ্জাবোধ মোটেও প্রবল নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, নকলের ওপর ছাত্রছাত্রীদের বড়ো অংশেরই নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পাচ্ছে, শিক্ষক সমাজও নকলের প্রশ্নে অভিন্ন অবস্থান দেখাতে পারছেন না; থানা-প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন-এর কোনোটিই নকলের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান দৃঢ়ভাবে নিচ্ছে না। এটি গুরুতর অপরাধ, এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে— এতোটুকু অবস্থানও এ সকল মহল থেকে নেওয়া হচ্ছে না। দেশের পত্রপত্রিকাগুলো এ নিয়ে কথা বলছে, পাঠক হিসেবে আমরা পড়ছি; কিন্তু পরিবর্তনের কার্যকর ব্যবস্থা যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া দরকার তারা কেউই তা নিচ্ছে না, নিতে পারছে না। ফলে প্রতিবছরই পাবলিক পরীক্ষাগুলো ক্রমাবনতিশীল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে; একে রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। অথচ স্কুল পরীক্ষাগুলো এভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। স্কুল পরীক্ষায় নকল এভাবে প্রকাশ্যে চলে বলে শুনছি না, সেগুলোতে অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন এবং এমনকি শিক্ষকদের একটি অংশ জড়িত আছেন বলে শোনা যায় না। কিন্তু চিত্রটা পাল্টে যাচ্ছে পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে। যে শিক্ষক স্কুল টেস্ট পরীক্ষায় পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করছেন একজন নকলবিরোধী শিক্ষক হিসেবে, তিনিই এসএসসি পরীক্ষার পরিদর্শনকালে নিজেকে সেভাবে উপস্থাপন করছেন না। কোথাও পরিবেশ তার বিপক্ষে, কোথাও তিনি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন। যে অভিভাবক কোনো স্কুল পরীক্ষার সময় স্কুল মাড়াননি, দেখতেও চাননি স্কুলটি কেমন, তিনি বা তারাই এসএসসি পরীক্ষার সময় কেন্দ্রে এসে ভিড় জমান, কেউ কেউ নিজের পরীক্ষার্থীকে নকল সরবরাহে অংশ নিচ্ছেন। আমাদের সমাজ থেকে বিবেকবোধ কতোখানি লোপ পেলে এমন দৃশ্য দেখতে হয়?

আমাদের কলেজ-শিক্ষায় পাবলিক পরীক্ষা ব্যতীত নিয়মিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার তেমন কোনো নিয়ম নেই। তারপরও কলেজগুলোতে যে সব অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা এতোখানি নকলনির্ভর থাকে না, শিক্ষকগণ থাকেন নকলবিরোধী। কিন্তু পাবলিক পরীক্ষায় সেই পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউ নিচ্ছেন না, পরিবেশটাই পাল্টে যাচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে— এর কিছু কারণ এবং উত্তর আমরা খুঁজে দেখতে পারি। প্রথমেই বলে রাখি, এ মুহূর্তে শহরের কিছু নামীদামি স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত প্রায় সকল পরীক্ষা কেন্দ্রেই পাবলিক পরীক্ষায় কমবেশি নকল হচ্ছে। প্রতিদিন যে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী নকলের অভিযোগে বহিষ্কৃত হচ্ছে বলে আমরা জেনে থাকি, তাতে প্রমাণিত হয় না যে, ঐ কেন্দ্রের অপর ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার নিয়ম মেনেই পরীক্ষা দিচ্ছে, তারা নকলনির্ভর নয়। বাস্তব চিত্রটি এ রকম হলে দেশের পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে আমাদের এতোখানি দুশ্চিন্তায় ভুগতে হতো না। আমার মনে হয় যারা বহিষ্কৃত হয়, তাদের স্রেফ কপাল মন্দ! শহরের

কিছু ভালো স্কুল বা কলেজ কেন্দ্র ব্যতীত দেশের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রেই নকলের ওপর ছাত্রছাত্রীদের নির্ভরশীলতা থাকে ব্যাপকভাবে। মাদ্রাসাগুলোর অবস্থাও একই। পরীক্ষা কেন্দ্রের ওপর ছাত্র-অভিভাবক, স্থানীয় রাজনৈতিকসহ নানান মহল চাপ সৃষ্টি করে থাকে। কর্তৃপক্ষের মধ্যেও দুর্বলতা থাকে, নিজ প্রতিষ্ঠানের 'স্বার্থ' রক্ষা করার প্রবণতাও কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। আসলে অভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার জন্য দেশব্যাপী প্রায় একই মানের পরীক্ষার পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। কোথাও হাটবাজারের মতো খোলামেলাভাবে, কোথাও কিছুটা নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এক কেন্দ্রে নকলের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে পাশের কেন্দ্র এই অজুহাতে কড়াকড়ি শিথিল করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। অপরদিকে কড়াকড়ির কেন্দ্রকে অনুসরণ করার প্রবণতা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। ফলে পরীক্ষার মূল চেতনাই এতে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যাচ্ছে। দেশব্যাপী এটির পুনরুদ্ধার কিছুতেই যেন সম্ভব হচ্ছে না এবং হবে বলেও মনে হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে যতোই সার্কুলার জারি করা হোক না কেন, কিছুসংখ্যক পরীক্ষা কেন্দ্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কঠোর আদেশ-নির্দেশ কার্যকর করলেও অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রই তা করছে না বা করতে পারছে না। ফলে কোথাও নকল যথেচ্ছভাবে হচ্ছে, চলছে; কোথাও সেরকম হচ্ছে না, হতে পারছে না। ফলাফলের ক্ষেত্রে এর ফলে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, ফলাফলে যথাযথ মেধার প্রতিফলন ঘটছে না। বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ কাজ নয়; আবার এ সব অঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা যাবে না— এই নীতিও কার্যকর করা সম্ভব নয়। কেননা স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসার সংখ্যা প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলে বেশি থাকলে ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান এবং যাতায়াতের কথাও কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে হবে। এ মুহূর্তে এসএসসি পরীক্ষার পরীক্ষার্থী প্রতিবছরই বাড়ছে, সুতরাং কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়ছে। কেন্দ্রের সংখ্যা যতো বেশি হচ্ছে এই অবস্থায় তা গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাকেই ততো বেশি নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে বা নেওয়া হচ্ছে। আসলে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট বা পরিদর্শন টিম দিয়ে পরীক্ষাটা হয়তো কড়াকড়ি করা যাবে, কিন্তু নকল প্রতিরোধ করা যাবে— এই ধারণা বাস্তবসম্মত নয় বলেই মনে করি। এটি কোনোদিনই দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা যাবে, তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। নকল প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিবছরই সরকার থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, বিপুল পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট-পরিদর্শক নিয়োগ করেও দেখা যাচ্ছে ফল প্রায় একই— নকল হচ্ছে, ভাঙচুর হচ্ছে, হাঙ্গামা

> **অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পাবলিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বাড়তি উপার্জনের পন্থা উদ্ভাবন করে থাকে। ফলে একটি পাবলিক পরীক্ষার জন্য অভিভাবকদের কয়েক হাজার টাকার সংস্থান করতে হয়। এটিও অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষায় নকলনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এভাবেই নকল হয়ে উঠছে মহাশক্তিধর একটি প্রবণতা।**

হচ্ছে। আমি নিকট-অতীতেও কয়েকটি লেখায় উল্লেখ করেছি, নকল প্রতিরোধে অর্থ, লোকবল এবং মনোযোগ অধিক পরিমাণে নিয়োগ করার চেয়ে নকলকে অকার্যকর করার উদ্যোগই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডগুলোকে নিতে হবে। কথা হচ্ছে, কীভাবে তা কার্যকর করা সম্ভব। নকলকে অকার্যকর করা বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি তা একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি; বর্তমানে ব্যাপকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নকলপ্রবণ হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার স্বাভাবিক চর্চা ও নিয়ম দুর্বল হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই লেখাপড়া যথাযথভাবে হচ্ছে না, ছাত্রছাত্রীদেরকে নিচের ক্লাস থেকে প্রস্তুত করা হচ্ছে না। সেই দায়িত্ব স্কুল বা কলেজ, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা যথাযথভাবে পালন করছে না। বিশেষত আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার মান যে পর্যায়ে নেমেছে, তার ফলে গ্রামের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই ক্লাস ও স্কুল ডিঙিয়ে মাধ্যমিক স্কুলে আসলেও সেখানে পড়াশোনার প্রস্তুতি তাদের বড়ো অংশেরই নেই। আবার মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ভালো শিক্ষকের অভাব, ব্যবস্থাপনার সমস্যা ইত্যাদি কারণে ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনীয় লেখাপড়া যথাযথভাবে হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ইংরেজি, অঙ্ক এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রয়োজনীয় জ্ঞান কিছুতেই অর্জন করতে পারছে না। এর কারণ হচ্ছে, নিচের ক্লাস থেকেই ছাত্রছাত্রীকে ইংরেজি ভাষা শেখানোর কোনো নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে না। দক্ষ, অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্পর্শও এরা পাচ্ছে না। অঙ্ক শেখার ক্ষেত্রেও স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব সর্বত্র। এমনকি মাতৃভাষা বাংলা শুদ্ধভাবে ছাত্রছাত্রীকে উচ্চারণ করতে, বলতে ও লিখতে পারার মতো করে শেখানোর দায়িত্ব আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যথাযথভাবে পালন করছে না। ফলে আমাদের ছাত্রছাত্রীর বড়ো অংশ নিচের ক্লাস থেকেই প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এরা 'খারাপ' ছাত্র হিসেবে সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, বেড়ে উঠছে। একটা দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী যখন মানসম্পন্ন লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে, নিজেদের মেধার বিকাশ যথাযথভাবে ঘটাতে পারে না, বিভিন্ন বিষয়জ্ঞানে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হতে পারে না, স্বভাবতই এদের সম্মুখে যখন পাবলিক পরীক্ষার মতো অতো বিশাল একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তখন অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়, অভিভাবকদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়ে। পাবলিক পরীক্ষাকে নিয়মিত পরীক্ষা থেকে অতি বড়োমাপের ও মানের একটা কিছু ভাববার মানসিকতা এবং প্রচারণাও সমাজে প্রচলিত আছে। তাছাড়া পাবলিক পরীক্ষাগুলো বেশ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পাবলিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বাড়তি উপার্জনের পন্থা উদ্ভাবন করে থাকে। ফলে একটি পাবলিক পরীক্ষার জন্য অভিভাবকদের কয়েক হাজার টাকার সংস্থান করতে হয়। এটিও অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষায় নকলনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এভাবেই নকল হয়ে উঠছে মহাশক্তিধর একটি প্রবণতা। এর সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা, দল, গোষ্ঠী, প্রশাসন — প্রত্যেকেই নকলব্যাধিতে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে। এর থেকে উদ্ধারের পথ হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানসম্পন্ন শিক্ষার দায়িত্ব পালন করার বাধ্যবাধকতায় আনতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে, শ্রেণীভিত্তিক লেখাপড়ার মান নিশ্চিত করতে হবে, বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক বিষয়ে ছাত্রছাত্রীর ভয় দূর করতে হবে, তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা শ্রেণীকক্ষে অর্জন করার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বহন করতে হবে। আমাদের প্রধান ঘাটতিই হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব পালনে অবহেলা, যোগ্য, মেধাবী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ব্যাপক অভাব। শিক্ষকতা এখনো মেধাবীদের আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়নি, গড়ে ওঠেনি; ন্যূনতম সেই সুযোগ-সুবিধা তাতে প্রায় নেই বললেই চলে। শিক্ষকতা পেশাকে শুধু মহৎ বললেই হবে না, একজন শিক্ষকের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সুযোগও থাকতে হবে। তবেই মেধাবীরা শিক্ষকতার সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তরে ভিড় করবে, আকৃষ্ট হবে। এই প্রক্রিয়া যেখানে আছে সেখানে মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রার্থী ছাত্রছাত্রী কীভাবে ভিড় করছে— তা কি বলে দিতে হবে? যে স্কুল বা কলেজে লেখাপড়ার মান ভালো সেখানে পাবলিক পরীক্ষায় পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেটের দরকার পড়ে না, নকল নিয়ে কর্তৃপক্ষকে খুব বেশি ভাবতে হয় না। কারণ ছাত্রছাত্রীরা জানে, নকল হচ্ছে দুর্বল ছাত্রছাত্রীর অবলম্বন করার বিষয়, পাস করার উপায়। কিন্তু ভালো ফল করতে হলে তাকে তার সারা বছরের প্রস্তুতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে পরীক্ষার হলে, পরীক্ষার খাতায়। তাই এসব ছাত্রছাত্রীর ভাবনার কোনো কোনাতেই নকলের স্থান থাকে না, বরং তারা নিজেরাই পরীক্ষাকে নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত করছে, নকলকে অকার্যকর করে দিচ্ছে। সারা দেশে এভাবে নকলকে অকার্যকর করতে হলে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই মানসম্পন্ন লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই এ ধরনের লজ্জাজনক পাবলিক পরীক্ষার অবসান হতে পারে।

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী : অধ্যাপক ও ডীন, সমাজ বিজ্ঞান, কলা ও ভাষা অনুষদ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, কলাম লেখক।